পরিক্রমা

‘সর্বোত্তম নরলীলা’

কালের স্রোতে ‘জীবন-যৌবন-ধনমান’ ভেসে যায়। শিল্পী-কবির চোখে ‘একবিন্দু নয়নের জল’ তাজমহলের শুভ্ররূপে জেগে থাকে। রাসরজনীর কূলে একদিন মিলন-বিরহের দিব্যমাধুরী অবতীর্ণ কিশোরকৃষ্ণের ছোঁয়ায় রূপ নিয়েছিল। পবিত্র কিশোরীর প্রেম যমুনার দুকূল প্লাবিত করে ভাসিয়েছিল বৃন্দারণ্য, আর কিশোর ভগবানের অন্তর। মিলনের আর এক রূপ বিরহ। ব্রজ ছেড়েছেন গোপীদের প্রাণের ধন কৃষ্ণ। মথুরার পথে তাঁর যাত্রা। মধুপুরীর লীলায় ঐশ্বর্যের বিলাস। ব্রজের লীলায় শুধুই মাধুর্য। ঐশ্বর্য লুকিয়ে মাধুর্যের আস্বাদন। এ-লীলায় মর্ত্যের ভোগবিলাসের গন্ধমাত্র নেই।

রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যে লালিত কৃষ্ণসখা উদ্ধব। জ্ঞানের মূর্তি। গ্রাম্যগোপবালিকাদের হৃদয়ের কোনও সংবাদই তাঁর জানা নেই। শাস্ত্রের গুরুগম্ভীর জ্ঞানচর্চায় তাঁর আনন্দ। সখাকেও দেখেন জ্ঞানের দৃষ্টিতে। তবু সখার প্রতি প্রেমের একটা নিগূঢ় বন্ধন অনুভব করেন। তাঁর দিব্যদেহের ছোঁয়া লাগা প্রসাদি বস্ত্র, উত্তরীয়, চন্দন, মাল্য ধারণে তাঁর পরম প্রীতি। প্রকটিত ভগবানের রূপ-গুণে মন তাঁর মোহিত। প্রেমের বিগ্রহের সঙ্গে জ্ঞানীসখার মিলন আশ্চর্য সংযোগ। বৃহস্পতিতুল্য সেই সখার কাছেই একদিন ব্রজের বিরহে ব্যাকুল মথুরানিবাসী কৃষ্ণের আর্তি নামল চোখের জলে। অশ্রুভারাক্রান্ত সে-মুখ ব্রজজনের বিরহে ব্যথাতুর, ব্যাকুল। ‘গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য’—হে সৌম্য উদ্ধব, একবার আমার জন্য ব্রজে যাও, তাদের সান্ত্বনা দিয়ে এসো। আমি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারিনি। কর্তব্যের শিকলে বাঁধা পড়েছি। ভগবানের পক্ষে ব্রজে যাওয়া কী এমন কথা? যিনি অনন্ত ঐশ্বর্যের স্বামী, প্রকৃতিও যাঁর বশীভূত, যাঁর বলস্ফুরিত শক্তি দানবকুলকে পরাস্ত ও হতবল করেছে, তাঁর পক্ষে মথুরার ক্ষেত্র ছেড়ে ব্রজের পথে চলা কী এমন দুঃসাধ্য! অথচ তাঁরই আঁখির পাতায় জমেছে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। মাধুর্যের লীলাভূমি বৃন্দাবনের ব্রজধাম এক স্মৃতিধন্য স্থান লীলাময় হরির। সেখানে তাঁর দানবনিধনরূপ অলৌকিক শক্তির প্রকাশও মাধুর্যের কাছে ম্লান। মথুরার বৈভবে সন্তপ্ত শ্রীকৃষ্ণ নীরবে ব্রজের প্রেমাস্পদদের জন্য গোপনে অশ্রুবিসর্জন করছেন। যে-মেঘশ্যামল রূপ গোপগোপীদের মনপ্রাণ হরণ করত, সেই মেঘ আজ বর্ষণরত। এ কী রহস্য! যুগে যুগে অবতারের মানুষভাবের চকিত দর্শন এমনভাবেই পাওয়া যায়।

ব্রজগোপীরা লেখাপড়া জানতেন না, পাণ্ডিত্য ছিল না তাঁদের। তাঁরা ‘আয়রে, খারে, নেরে’ করে ব্রজগোপালকে ভালবাসতেন। নিজেদের উজাড় করে এমন ভালবাসা ছিল দুর্লভ এবং সেটি নিবেদিত হয়েছিল সাক্ষাৎ ঈশ্বরের চরণে। ভগবান তার মূল্য বুঝতেন, মূল্য দিতেন। তাই উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের শোকদীর্ণ মূর্তি ও বিরহের আর্তি দেখতে। বলছেন উদ্ধবকে, ‘‘তারা আমা বই কিছুই জানে না। গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল শুকিয়ে গেলে কূর্মগুলো কাদার মধ্যে কোনওক্রমে বেঁচে থাকে। তেমনি আমার বিরহের তাপে পুকুরগুলি জলশূন্য। কেবল বলেছিলাম—আবার দেখা হবে।

সেইটুকু কথায় বিশ্বাস করেই ব্রজদেবীরা প্রাণধারণ করে আছেন। তাদের কাছে আমার সংবাদ পৌঁছে দিয়ো।" ভগবান উদাসীন নন, ভুলেও থাকেন না। উদ্ধবের মুখে ব্রজবাসীদের বিরহকথা শুনে সব ভুলে কেঁদে ওঠেন। এই চিত্রও ভাগবত ধরে রেখেছেন। শুদ্ধ ভক্তদের প্রাণের সম্পদ তাঁর এই মানুষী লীলা ।

যুগাবতারের মানুষভাবের কারুণ্য মানুষের মনে বিস্ময়ের ঘোর এনেছে। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে হারিয়ে বনে বনে রোদন করেছেন। ''পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" লক্ষ্মণ পর্যন্ত সীতার বিরহে ব্যথাতুর রামচন্দ্রের অভূতপূর্ব বিহ্বলতা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। বনের পথে শত বিপদে, দুর্বিপাকে পড়েও তো রামচন্দ্র আত্মহারা হননি! সেই মর্যাদাপুরুষোত্তমের এ কী অভূতপূর্ব শোকোচ্ছ্বাস! ''বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি।/ লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি॥" —কবি ভবভূতি শ্রীরামচন্দ্রের কথাপ্রসঙ্গেই এই মন্তব্যটি করে গিয়েছেন। মিলনের মাধুর্য, বিরহের অশ্রুবন্যা, চরিত্রের বজ্রকঠোরতা, কুসুমের পেলবতা—সব একই আধারে স্থানে কালে জেগে উঠেছে। এ এক রহস্য—মানবচরিত্রের গভীর রহস্য। অবতারের লীলায় এই প্রকাশ দেখে মানুষ ধন্য, কৃতকৃতার্থ। এইটি না থাকলে তিনি আমাদের নাগালের বাইরেই থাকতেন। মানুষরূপে ধরা দিতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের কথা কামারপুকুর গ্রামে ও দক্ষিণেশ্বরে নানা মানুষের মুখে মুখে ফিরত। অতি বিচক্ষণতায় সেগুলি থেকে সারাংশ সংগ্রহ করে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লীলাগ্রন্থে গেঁথেছেন। পূর্বপূর্ব অবতারদের ঐশ্বর্যলীলায় তাঁদের মানুষভাব অনেকটাই আবৃত ছিল। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের চিত্র স্পষ্টরেখায় তুলে ধরা নেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কোনও কোনও বিরল মুহূর্তে তাঁদের শ্রীমুখকথিত কথালাপে অকস্মাৎই প্রকাশিত হয়েছে গোপন লীলাকাহিনি, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখবেদনাময় জীবনের অনুভূতি।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় মাধুর্য ও মানুষভাবই ভক্তদের আকর্ষণ করত। এবার নরেনের জন্য তিনি অশ্রুবিসর্জন করেছেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে সিমলের দূরত্বও মথুরা থেকে বৃন্দাবনের মতোই। কায়েতের ছেলে নরেন দত্তকে দেখার জন্য তাঁর আকুলতা দেখে ভক্তদের মনে হত, কী এমন ছেলে নরেন? লেখাপড়া তো কলেজ পর্যন্ত। মহা আমুদে, বন্ধুবৎসল, শ্রীরামকৃষ্ণের টান পর্যন্ত উপেক্ষা করে, কারও ধার ধারে না—এমন ছেলের জন্য এত টান? এ-টানের কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

এযুগে তাঁর মানুষভাবের মধ্যেই ওঠা বসা। সহজ সমাধিতে ঈশ্বরীয়ভাবে মগ্ন থেকেও ওই মানুষভাবকেই ধরে রাখছেন। মান, যশ, অলৌকিক ঐশ্বর্য, রোগ সারানো, ঝাড়ফুঁক—এসবের থেকে তিনি অনেক দূরে। তাঁর আশেপাশেই আসছেন ও থেকে যাচ্ছেন ওষুধ-দেওয়া ব্রহ্মচারী, হঠযোগী, যাঁরা শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য প্রাণায়াম, নেতি-ধৌতি করছেন। তিনি রাজযোগকে মূল্য দিচ্ছেন, যার দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধান সহজ হয়। রোগ সারানোর নামে শিহরিত হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, পাছে সেখানে একটা হাসপাতাল হয়ে যায়। অথচ তিনিই নরনারায়ণের সেবায় নরেন্দ্রকে প্রেরণা দিচ্ছেন। গুরু, কর্তা, বাবা—এসব শব্দের ব্যবহারে বিরক্তি বোধ করছেন। তিনি তাহলে কে? তাঁর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্তের গভীর তত্ত্বের প্রকাশ কী করে হচ্ছে! শাস্ত্র পড়ার মতো বিদ্যার্জন করেননি তিনি। কৌতুক করে বলছেন, ''আমি মূর্খোত্তম।" শোনার মাধ্যমেই তাঁর শেখা সম্পূর্ণ হয়েছিল। প্রখর বিবেকবুদ্ধির আলোকে শাস্ত্রের সার ও অসার বস্তু তাঁর কাছে সর্বদাই পৃথক থাকত।

তিনি বিদ্বান পণ্ডিতদের সঙ্গে যেমন জ্ঞানের

কথা কইতেন, তেমনি মন্দিরের খাজাঞ্চি, রসিক মেথর, বাবুদের বাড়ির দাসী, দারোয়ান, বারাকপুর থেকে আসা সেপাই—সকলের সঙ্গেই সহজভাবে মিশতেন, আলাপ করতেন। কলকাতার শিক্ষিতসমাজে তাঁর 'পরমহংস' নামটি প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। এই সহজ-সরল-ঈশ্বরপ্রেমী মানুষটির টানে কত মানুষ যে দক্ষিণেশ্বরে আসত তার তালিকা আমাদের জানা নেই। শুধু সমাধি দেখার জন্য নয়, মানুষটি সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল সীমাহীন। সে-টানের কথা লাটু মহারাজের মুখে শোনা যায়। গোপীদের টানের কথায় তিনি বলেছিলেন যে, অবতারের টানের কাছে সব টানই হার মানে। এবার অবতারের চারদিকে মাধুর্য ও ভালবাসার বৃত্ত। সে-বৃত্ত ছুঁয়ে রয়েছে গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষ। কামার-কুমোর-তাঁতি, হিন্দু-মুসলমান, বাউল-বৈষ্ণব সকলেই। কলকাতার বৃত্তে আছেন জমিদার ও ব্রাহ্মসমাজ। সকলের কাছেই তিনি পরমহংস হয়েও দরদি মানুষ। কথামৃতের পাতায় ওই মানুষভাবেরই পরাকাষ্ঠা। সেই অচিনে গাছকে চিনেছিলেন অতি মুষ্টিমেয় কিছু ভক্ত। অন্তরঙ্গ ত্যাগী সন্তানেরা সেই চিরউন্মদ প্রেমপাথারের তরঙ্গে ভেসে গিয়েছিলেন। তাঁর বিরহে রাতের পর রাত নরেনের বালিশ ভিজে যেত। তাকে নিংড়ে শুকোতে হত। শিবানন্দ মহারাজ গাইতেন বিরহবিধুর কীর্তনের পদ—''হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা/ বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা।'' কেউ ডুবলেন শাস্ত্রচর্চায়। বেশির ভাগই নিঃসম্বল হয়ে পথে বেরিয়ে তীর্থে তীর্থে তপস্যা করে প্রাণের জ্বালা জুড়োতে চাইলেন। কেউ বা তাঁর অস্থি নিয়ে পোড়ো বাড়ি জাগিয়ে পূজা-সেবায় ডুবে গেলেন।

বরানগর মঠে তাঁর বিরহে জ্বলে উঠেছিল মহাসাধনার হোমাগ্নি। শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দময় সান্নিধ্যে যাঁদের হৃদয় উত্তাল হত, তাঁর বিরহে সে-ভাব যেন প্রগাঢ়, ঘনায়িত হল। এবারে ত্যাগ-বৈরাগ্যের রাজার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা ওই বৈরাগ্যের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে ভারতের তীর্থে তীর্থে ছড়িয়ে পড়লেন। এঁরা শ্রীরামকৃষ্ণভাবের ফকির, নিঃসম্বল, অথচ পরিপূর্ণ। সাক্ষাৎ অবতারকে দেখেছেন, তাঁর ভালবাসা পেয়েছেন তাঁরা—যে-ভালবাসা বাপ-মাও বাসতে পারেন না। তাঁরা দুচোখ ভরে দেখেছেন পবিত্রতা, কাম-কাঞ্চন ত্যাগের অলৌকিক ঐশ্বর্য, দেখেছেন মানুষের জন্য তাঁর আর্তি—''নিরক্ষর দীনহীন রোগে দেহ বিমলিন/ উন্মত্ত পাগল যেন সাজিয়া দীন ভিখারি।''

শ্রীগৌরাঙ্গ ঘরে ঘরে যেচে প্রেম দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষী তনুর দুর্বলতার জন্য পায়ে হেঁটে যেতে পারেননি কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি করে ভক্তদের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন। মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখলে সমাদর করেছেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর টান যেন আপাতদৃষ্টিতে পক্ষপাত। কিন্তু চিন্তা করলে মনে হয় মানুষের কল্যাণে তিনি ওই প্রাণবন্ত ছেলেকে বলির বেদিতে বসিয়ে দিলেন। এবারের লীলা পুরাণের কল্পনাকেও ছাড়িয়েছে। ব্রজগোপীর প্রতি প্রেম, সীতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আর্তি, বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুসজল নিবেদন—এর সবটাই মানুষের ভালবাসার মতোই, বিরহও তেমনই তীব্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্তানদের পক্ষীমাতার মতন স্নেহে-ভালবাসায় আগলে রেখেছেন। তাঁদের পরীক্ষা হবে জীবন দিয়ে। যে-মানুষভাব নিয়ে অষ্টসিদ্ধিকে তিনি সরিয়ে অতি সাধারণ হয়ে আছেন, সেই ভাবকেই সম্বল করে দ্বন্দ্বময়, সমস্যাদীর্ণ সংসারে শ্রীরামকৃষ্ণ-তনয়রা অর্ধাহারে, অনাহারে, কখনও গাছতলায়, কখনও দরিদ্রের পর্ণকুটিরের ছায়ায় তপস্যা করে গেছেন। ক্রূর সংসার তার আচরণে সহায়তা দেয়নি নিঃসম্বল এই সাধকদের। শুধুমাত্র ঈশ্বর আর শ্রীগুরুর প্রেমই সম্বল ছিল দীন পরিব্রাজকদের। এঁদের মধ্যে যাঁরা চিহ্নিত, যাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণ চাপরাশ দিয়েছিলেন,

তাঁরা লোককল্যাণে তিলতিল করে নিজেদের উৎসর্গ করে গড়ে দিয়েছেন সঙ্ঘের দৃঢ় ভিত্তি। অলৌকিক শক্তির আশ্রয় নেননি।

মানুষভাবের ওপর অবতারের এত গুরুত্ব কেন? মানুষকে পথ দেখানোর জন্য। দৈবনির্ভরতা নয়, আত্মনির্ভরতা, পবিত্রতা, মনুষ্যত্ব ও হৃদয়বত্তা। এসব গুণ সব মানুষের মধ্যেই থাকে। তারই পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে ধীরে ধীরে মানবকুলে। চরিত্রবান মানুষ জন্ম নেবে শ্রীরামকৃষ্ণের পদানুসরণে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই বিকাশের নতুন ছক কষে দিয়েছেন। তা সঙ্ঘের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ বৈদিক যুগের মতো বলতে পারবে 'বৃহদ্ বদেম'। বৃহৎ, মহৎ ভাবের আলোকে আত্মশক্তিকে বরণ করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবারে মানুষভাবের ওপর অনেক আস্থা স্থাপন করেছেন—''মানুষ কি কম গা, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে।'' বাস্তবিক মানুষভাবের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের এই গুরুত্ব স্থাপন আমাদের মতন সামান্য মানুষদের জন্য। যাঁরা এতদিন ধর্মের নামে অনবরত অলৌকিক কিছু খুঁজেছেন, তাঁরাও চিন্তা করবেন, থমকে দাঁড়াবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব পুরুষকার, বীর্য, সত্যের প্রতি আনুগত্য—এসবই আমাদের জন্য। একটি বহুল প্রচলিত শ্লোক :

''অকৃত্বা পরসন্তাপং অগত্বা খলমন্দিরম্।
অক্লেশয়িত্বা চাত্মানং যদল্পমপি তদ্বহু॥''

—পরকে কষ্ট বা সন্তাপ না দিয়ে, নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা কামনা পূরণের জন্য খল বা অসৎব্যক্তির আশ্রয় বা সহায়তা না নিয়ে এবং অন্তরস্থিত আমাকে ক্লিষ্ট না করে যদি অল্প কিছু করা যায় তবে তা-ই বহু। আত্মা শব্দের অর্থ কখনও দেহ, কখনও মন, কখনও বা চৈতন্যস্বরূপ সত্তা। দেহকে কলুষিত, অপবিত্র না করে, শরীরের যেটুকু প্রয়োজন পুষ্টিসাধন উপেক্ষা না করে, মনকে শুভ চিন্তায় পরিপুষ্ট করে জীবন চালিয়ে যাওয়া কম কথা নয়। অন্যদিকে অন্তরে বিরাজ করছেন আত্মা—যিনি অজর, নির্বিকার, শুদ্ধ ও মুক্ত। তাঁকে যে ভুলে থাকে, শাস্ত্রীয় পরিভাষায় তাকে বলা হয় আত্মহা—সে আত্মাকে ভুলে তাকে জড় দেহেই যেন হত্যা করেছে, চৈতন্যের আলো-কে আবৃত করে রেখেছে। আত্মার জাগরণ, চৈতন্যের স্ফুরণের মধ্যেই জীবনের মহিমা।

শ্রীরামকৃষ্ণের ওইসব গুণ, নৈতিকতা, সত্যাচরণ তাঁর মানুষভাব। মানুষের প্রতি সহানুভূতি, হৃদয়ভরা মমত্ব ও ভালবাসাই তাঁকে আমাদের কাছের মানুষ করে দিয়েছে। তারণের জন্য আবার জন্ম নেওয়ার অঙ্গীকার তাঁর মানুষভাবকে প্রকাশ করেছে। তিনি আমাদের ভালবাসার জন, লক্ষ মুখে নয়, একটি মুখেই আহার করে ভক্তচিত্ত তৃপ্ত করছেন। মানুষের দুর্বলতায় বুলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর স্নেহহস্ত। প্রত্যেক কাজটি বিচারবুদ্ধি নিয়ে করতে উপদেশ দিচ্ছেন। একঘেয়ে ভাব পছন্দ করছেন না, উদারবুদ্ধি নিয়ে চলতে বলছেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে শরীর, বস্ত্র, বিছানা পরিচ্ছন্ন রাখছেন। যেখানকার জিনিস সেখানে রাখতে শেখাচ্ছেন। ছোটখাট ব্যাপারেও সত্যরক্ষা করে চলছেন। বস্ত্র, ছাতা এবং পাদুকা ছিন্ন হলে ব্যবহার করতে নিষেধ করছেন। জীবন হবে শ্রীময় ও সুন্দর। অবতারজীবনের এত খুঁটিনাটি কি কোথাও নথিবদ্ধ পাওয়া যায়? জীবনযাত্রার এই শুচিতা আন্তর সৌন্দর্যের পরিচায়ক। অনন্ত বিশ্বের মালিক এমনভাবেই মানুষকে শেখাচ্ছেন। তাঁর মানুষভাবকে হৃদয়ে ধারণ করেই এযুগের মানুষের উত্তরণের সম্ভাবনা। সাজগোজ নেই, তবু এক প্রবীণ মানুষের আনন্দময় সমাধিমূর্তি দেখে ভক্তদের হৃদয় ভরে যাচ্ছে। সহজ হয়ে মানুষ সহজকে চিনছে। এ এক নতুন যুগের নতুন ঠাকুর—'মাধুর্যঘনমূরতি' সহজ-সরল নরোত্তম। তাঁর চরণে প্রণাম।